ক্ষত্রিয় আন্দোলন এবং পঞ্চানন বর্মার রাজনৈতিক জীবন

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চানন বর্মা জন্মেছিলেন করদ-মিত্র রাজ্য কুচবিহারে। ভারত স্বাধীন হবার পর রাজ্যটি পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় পরিণত হয়েছে। রাজার নামে রাজ্য পরিচালনা করতেন বহিরাগত উচ্চবর্ণের কর্মচারীবৃন্দ। এই সব রাজকর্মচারীদের মধ্যে ছিল অহংকার। এই উন্নাসিকতার জন্য পঞ্চানন বর্মা উচ্চশিক্ষিত হয়েও এ রাজ্যে তাঁর চাকুরী হয়নি। কিছু কিছু কাজের প্রতিবাদ করায় রাজপরিবারের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে কোচবিহার রাজ্য পরিত্যাগ করে ১৯০১ সালে ওকালতি করার জন্য ব্রিটিশ শাসিত রাজ্য রংপুরে চলে যান। রংপুর জেলাকে তিনি কর্মক্ষেত্র এবং সাধনাক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। রংপুর জেলা জজ কোর্টে তিনি আইন ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। রংপুর জেলা জজ কোর্ট ছিল বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। এখানে লৌহমানব রাজা রামমোহন রায় ডেপুটি কালেক্টর পদে আসীন ছিলেন। এখানেই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। কথিত আছে সেই সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "দেবী চৌধুরাণী" রচনা করেছিলেন। বর্তমানে দেবী চৌধুরাণী নামে একটি রেল স্টেশন আছে। তাঁর লিখিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আনন্দমঠের ঐতিহাসিক সাহিগঞ্জে ভবানী পাঠকের মন্দির। এরূপ ঐতিহাসিক পরিবেশে ধীরে ধীরে তাঁর মনের মধ্যে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হয়।

আইনজীবী হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন ঠিকই কিন্তু এই পেশা তার সুখকর হয়নি। প্রতিপদে তিনি উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। যে সমাজ ব্যবস্থা তিনি নিজ রাজ্য কোচবিহারে লক্ষ্য করেছিলেন তার থেকে কোন পার্থক্য তিনি এখানে দেখতে পাননি। এখানকার সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মীয় আচারআচরণ সর্বোপরি নিম্নবর্গের প্রতি উচ্চবর্ণের লোকদের দুর্ব্যবহার তাঁর মনকে ব্যথিত করে তুলেছিল। তৎকালীন সমাজব্যবস্থার অক্টোপাশ থেকে সমাজ জীবনকে মুক্ত করবার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু কিছু মহাপুরুষের জন্ম হয়েছিল। যেমন রামানুজ, রবিদাস, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য, একনাথ, সাধু তুকারাম প্রমুখ। এঁদের আন্দোলন সমাজের বিভিন্ন বিভিন্ন অংশে ভক্তিবাদের ঢেউ তুলেছিল ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী কোন সমাধান

দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। কোন দিশা দেখাতে পারেনি। এর পর খ্রিস্টান মিশনারীর দল। এদের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের বহু নিপীড়িত সমাজগোষ্ঠীর বিরাট একটা অংশ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। তাদের সংখ্যা এত ব্যাপক যে হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার উপক্রম হয়েছিল। এই সঙ্কটকালে সমাজ জীবনকে রক্ষা করার জন্য কয়েকজন যুক্তিবাদী সমাজ সংস্কারক এগিয়ে এসেছিলেন — এদের মধ্যে প্রধান পুরোহিতের স্থান দখল করেন রাজা রামমোহন রায়। এর পর বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, জ্যোতিরাও ফুলে বানারে এবং দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ।

আইন ব্যবসা জমে ওঠার মধ্যেই পঞ্চানন স্থির করেন সমাজের উন্নতি ও জাতির সেবায় আত্মোনিয়োগ করবেন। তিনি ভাবলেন "নিজের উন্নতি নয়, চাই জাতির উন্নতি"। কারণ সমাজের উচ্চমঞ্চে যাদের আবির্ভাব তাদের সঙ্গে সমাজের অবহেলিত মানুষের কোন কালেই স্থান ছিল না। চিরাচরিত দূরত্ব ধীরে ধীরে চিরস্থায়ী রূপ নিয়েছিল।

উচ্চবর্ণের লোকেরা মুখে যতই বড় বড় বুলি এবং মহান উদারতার কথা বলুন না কেন কাজের বেলায় নিজেদের জ্যাত্যাভিমানের বিবমময় বৈষম্য সব সময় বজায় রেখে চলেন। সেটা আরো প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক নেতাদের প্রচারের কৌশলে। জাতিভেদ প্রথার কলঙ্কদুষ্ট সেই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য আপসহীন সংগ্রামের পথে রাজবংশী জাতিকে আত্মপ্রত্যয়ের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে অবহেলিত পঙ্গু ঘুমন্ত গোষ্ঠীকে জাগরিত করার কাজে যে দুঃসাহসী নেতা এগিয়ে এলেন তিনি উত্তরবঙ্গ খ্যাত রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা। তিনি ভাবলেন অত্যাচারীর বিবেকের কাছে শুধুমাত্র আবেদন নিবেদনের পথে না গিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরের শোষিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ দাবি ছিল তাঁর ক্ষত্রিয় আন্দোলনের মূলমন্ত্র। অবশেষে স্থির করলেন আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন।

তিনি রমারোঁলা, ড. সান ইয়াৎ সেন এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের বই থেকেও উৎসাহ পেয়েছিলেন। জাঁ ক্রিস্তেফা বলেছেন "Life is a battle without armistice" জীবন এক বিরামহীন যুদ্ধ, সেই যুদ্ধের দেবতা অন্তরে বসে বলেন, "go and never rest." বিশ্রামের অবকাশ এখানে নেই। go and suffer you must go

suffer, you do not live to be happy, you will fulfil my law. suffer, die. But be what you must be a man"[১] ড. সান ইয়াৎ সেন তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন, "তখন চিনে বহুল প্রচারিত দার্শনিক মতবাদ ছিল যে, কর্মের দ্বারা কোন পরিবর্তন ঘটান যায় না নিয়তির বিধানকে। মানুষের কাজই হল নিয়তির বিধানকে জানা। "Knowledge is easy, Action is Difficult" — অর্থাৎ জ্ঞান সহজ, কর্ম কঠিন। ড. সান ইয়াৎ সেন এই মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে "Action is easy, Knowledge is difficult" — অর্থাৎ কর্মই সহজ, জ্ঞান কঠিন।[২]

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ সম্পর্কে নতুনভাবে আলোকপাত করেছেন, "সুরেন্দ্রনাথ চৈতন্যকে দেখিয়েছেন সমাজের বিদ্রোহীরূপে। সমাজ ও শাস্ত্রের নামে যে সব কৃত্রিম বেড়া মানুষকে — মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, সে সব কিছুকে চৈতন্য ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলেন। বেড়া ভেঙ্গে ফেলতে না পারলে জাতীর ঐক্যবোধের জাগরণ হবে কীভাবে?"[৩]

ইংরেজ শাসনের আগে ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের সূচনা হয়। ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের উত্তরবঙ্গ এর থেকে বাদ যায়নি। মুসলমান শাসনের সময় থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এই অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে - অবশ্য এর আগেও এই অঞ্চলে উচ্চবর্ণের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কিছু উচ্চ শ্রেণির হিন্দু জমিদার ছিল তবে সংখ্যায় নগন্য। ইংরেজ প্রবর্তিত অর্থনীতি, সমাজ-নীতি, ভূমিনীতি এই অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থাতে পরিবর্তনের সূচনা করে, ফলে উত্তরবঙ্গে কৃষিনির্ভর রাজবংশী সম্প্রদায়ের সমাজ ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। বহিরাগত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের একাংশ রাজবংশী সমাজকে অবহেলার চোখে দেখতে শুরু করল এবং ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিরও বিরোধীতা করতে লাগল। "এই ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি ঊনবিংশ শতাব্দির বর্ণ আন্দোলনের অন্যতম বিষয়। শুধু উত্তরবঙ্গেই নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবির আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বঙ্গের দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে মল্ল ক্ষত্রিয়, বর্গ ক্ষত্রিয়, পৌন্ড্র ক্ষত্রিয়, ওগ্র ক্ষত্রিয় আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বঙ্গের উত্তরাংশের রাজবংশী সমাজেও এই সূত্র ধরে ক্ষত্রিয়ত্ব আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল।"[৪]

বর্ণ হিন্দুদের বর্ণভেদ প্রথায় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী হিন্দু সমাজ

চিরকালেই অবহেলিত ছিল। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে উত্তরবঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন দানা বাধতে থাকে এবং বিশ শতকের সূচনা থেকে তা একটি পূর্ণাঙ্গ আন্দোলনের রূপ নেয় অনার্যচিত ব্রাত্যদের আর্যচিত সম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল এ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।[৫]

১৮৭২ সালে প্রথম আদমসুমারী হয়, সেই আদমসুমারীতে রাজবংশীদের সামাজিক মর্যাদায় নীচু জাত বলে দেখানো হয়েছিল বিশেষ করে কোচ ও রাজবংশী এক জাতি বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। এ. কে. রায় তাই বলেছেন — "The origion of the Kshatriya movement could be located in the harted and ill treatment received by the community at the hands of the upper caste of the Hindu Society, but at the immediate cause of the movement was Census of India 1891."[৬]

পর পর দুটো আদমসুমারীতে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি না মানায় ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। রংপুর কালেক্টরেটে কর্মরত হরমোহন রায় (খাজাঞ্চি) সেখানকার সমগোত্রীয় কর্মচারীদের নিয়ে "রংপুর ব্রাত্য ক্ষত্রিয় জাতির উন্নতি বিধায়নী" সভা স্থাপন করেন। রংপুর ব্রাত্য ক্ষত্রিয় উন্নতি বিধায়নী সভার মাধ্যমে রংপুরের ধর্মীয় সভার পন্ডিতগণের মতামত গ্রহণ করে রাজবংশীদের কোচ থেকে পৃথক সত্তার (রাজবংশী) জনগোষ্ঠী বলে পার্থক্য দেখানোর জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু সেই প্রস্তাব সরকার গ্রহণ না করায় পুনরায় আন্দোলনে নামেন। তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্কাইন সাহেব এর পর আবার রংপুর ধর্মীয় সভার মতামত চাইলেন। উক্ত সভা রাজবংশীদের ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলে স্বীকার করে এবং রাজবংশীরা কোচ থেকে আলাদা জাতি বলে স্কাইন সাহেবকে জানিয়ে দেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচন কমিশনারের কাছে লিখলেন যে রাজবংশীদের ব্রাত্য ক্ষত্রিয় লেখা হউক। কিছুদিনের জন্য ক্ষত্রিয় আন্দোলনের ভাটা পরে।

এখানে উল্লেখ্য যে হরমোহন রায় খাজাঞ্চী মহাশয় শ্যামপুরের জমিদার ছিলেন, বসবাস করতেন রংপুর শহরে। তিনিই প্রথম ব্রাত্য ক্ষত্রিয় জাতির উন্নতি বিধায়নী প্রতিষ্ঠা করেন।[৭] ১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ঐ সালের ১৯ শে মে পর্যন্ত বহু আবেদন-নিবেদন করেন রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়

জনগোষ্ঠীতে অর্ন্তভুক্ত করতে। রাজবংশী সম্প্রদায়ের ক্ষত্রিয় আন্দোলনের অগ্রদূত হরমোহন খাজাঞ্চী। এটা ছিল আন্দোলনের প্রথম ধাপ। পরবর্তীতে হরিমোহন রায় সহ তাঁর আন্দোলন সহযোগীদের আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। অন্যান্য সহযোগীরা হলেন কালীগঞ্জ থানা নিবাসী পণ্ডিত নবীন চন্দ্র সরকার এবং চিতাবাড়ি গ্রাম নিবাসী হরিমোহন সরকার প্রমুখ।

১৯০১ সালের আদমসুমারী রিপোর্টে রাজবংশীদের কোচ থেকে ভিন্নতর গোষ্ঠী দেখানো হয় এবং রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি অস্বীকার করা হয়। এর প্রধান কারণ রংপুর শহরের কিছু প্রভাবশালী জমিদার, উকিল ও মোক্তার এই আন্দোলনের প্রবল বিরোধীতা করায় শেষ পর্যন্ত ক্ষত্রিত্বের দাবি বাতিল করা হয়। রাজবংশী সম্প্রদায় আশাহত হয়ে পড়ে।

ঐ সময়ে (১৯০১) ক্ষত্রিয় সমাজের আলোর দিশারী হয়ে আসেন উত্তরবঙ্গের খ্যাতনামা পুরুষ রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা। রংপুরে তার আগমন ক্ষত্রিয় জাতির কাছে এক আশীর্বাদ স্বরূপ। তিনি কোচবিহার থেকে এসে রংপুর জজ কোর্টে যোগদান করেন এবং দেখলেন কোর্টে তিনি ছাড়া আর কোন রাজবংশী উকিল নেই। তিনি নিজ যোগ্যতা ও নেতৃত্বের বলে রংপুর এলিট সমাজে এক বিশিষ্ট আসন দখল করে নেন। রংপুর কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে সাহিত্য পরিষদের আলোচনা পর্যন্ত তিনি ছিলেন একমাত্র ব্যতিক্রমী মানুষ। ১৩১৩ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩১৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিনি রংপুর সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন[৮]। উক্ত মর্যাদা তাঁকে কেউ দান করেননি — নিজের যোগ্যতাবলে তিনি এলিট সমাজে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পঞ্চানন বর্মা পূর্বেই ঠিক করেছিলেন ওকালতি ছেড়ে দিয়ে সমাজের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করবেন। কিন্তু এতবড় পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে বর্ণহিন্দু বেষ্টিত শত্রুর বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার জন্য নেতৃত্ব দিতে পারে এমন ব্যক্তিত্ব রংপুর শহরে তার পাশে বলতে গেলে কেউ ছিলেন না। বর্ণ হিন্দুদের প্রতিরোধ আর আদমসুমারীর বিতর্কিত রিপোর্ট থেকে তিনি বুঝতে পারেন আন্দোলন ছাড়া রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি আদায় করা সম্ভব নয়। রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা উপলব্ধি করেছিলেন একটা ঘুমন্ত জাতিকে জাগাতে হলে গণবিপ্লবের প্রয়োজন। কিন্তু বিপ্লব অর্থে অস্ত্রদ্বারা বিপ্লব নয়। বিপ্লবের অর্থ সবঙ্গীন মুক্তি। শুধু বিদেশির গোলামি থেকেই নয়, নিজের দেশ ও সমাজে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে যে সব অন্যায়, অবিচার তারই অবসান ঘটাতে

হবে। মনকে মুক্তি দিতে হবে নানা কুসংস্কার, জড়তা আর মোহের নাগাল থেকে। নতুবা দেশের মানুষের শতাব্দীরকালীন নিদ্রা ভাঙানো যাবে না।

সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ইং ১৯১০ সালের ১ লা মে ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১৮ই বৈশাখ রবিবার নাট্য সমিতি প্রাঙ্গণে "ক্ষত্রিয় সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১৮ই বৈশাখ কর্তব্য নির্ধারণের জন্য রংপুর শহরে প্রথম ক্ষত্রিয় সম্মিলীন-র অধিবেশন বসে। কোচবিহার, গোয়ালপাড়া, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর এবং রংপুর থেকে ৪০০ প্রতিনিধি উপস্থিত হলেন। জলপাইগুড়ির উকিল শ্রীমধুসূদন রায় সভাপতিত্ব করেন এবং সম্পাদক নিযুক্ত হলেন পঞ্চানন বর্মা। নেতৃত্বের এই গুরু দায়িত্ব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহন করেছিলেন। এই সভায় কার্যকরি সমিতি গঠন (২) অর্থনৈতিক কমিটি (৩) পুস্তক প্রকাশন এবং প্রচার সম্পর্কে কমিটি গঠন করা হয়।

পঞ্চানন বর্মা সম্পাদক নিযুক্ত হয়েই ক্ষত্রিয় সমিতিটিকে শুধুমাত্র রংপুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে সারা উত্তরবঙ্গ, আসাম, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে দিলেন।

ক্ষত্রিয় সমিতি গঠনের প্রায় ৫ বছর পর ১৩২৪ (১৯১৮) বঙ্গাব্দে ক্ষত্রিয় ছাত্র সমিতি গঠন করা হয়। এ বছরেই ক্ষত্রিয় মুখপাত্র "ক্ষত্রিয় পত্রিকা"-র সূচনা করা হয়। ক্ষত্রিয় সমিতি গঠন হবার পরের বছর থেকে অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও পূর্ববর্তী সালের বৃত্তবিবরণী প্রকাশিত হতে থাকে। হরমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত রংপুর ব্রাত্যক্ষত্রিয় উন্নতি বিধায়ণী সভার উদ্যোগে ইতিপূর্বেই রাজবংশীদের পবিত্র যজ্ঞোপবীত গ্রহণের রেওয়াজ আরম্ভ হলেও গণ-উপনয়নের মাধ্যমে পৈতা নেওয়ার রীতি চালু হয় ক্ষত্রিয় সমিতির স্থাপনের দুবছর পর অর্থাৎ ১৩১৯ সালে।

রাজবংশী জাতির কাছে ২৭ শে মাঘ দিনটি একটি ঐতিহাসিক দিন। বাংলা ১৩১৯ সালের (১৯১৩ ইং) কোচবিহার মহারাজার জমিদারী জলপাইগুড়ি জেলার দেবীগঞ্জের পোড়লবাড়ি গ্রামে করতোয়া নদীর তীরে মহামিলন অনুষ্ঠানে ব্রাত্যত্ব মোচন করে গণউপনয়নের মাধ্যমে রাজবংশীরা পৈতা গ্রহণ করেন। নবদ্বীপ, কলকাতা, মিথিলা, কামরূপ, গৌরীপুর এবং কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি প্রভৃতি স্থানের স্বনামধন্য পণ্ডিতদের উপস্থিতিতে ধর্ম সভায় স্বীকৃত হয় যে রাজবংশীরা ব্রাত্যক্ষত্রিয় এবং তাদের ব্যবস্থা বিধান দ্বারা বাংলা ১৩১৯ সালে প্রায়চিত্ত করে গণউপবীত ধারণ করে ক্ষত্রিয়ত্ব অর্জন

করে। দাস উপাধি পরিত্যাগ করে সিংহ, রায়, বর্মন ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করে। এর পরে ১৯১৩ সালে সেন্সাস সুপারিনটেন্ডেন্ট O. Mally রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে লিখলেন "The former request was granted without hesitation, as there is no doubt the at present day, irrespective of any questions of origin, the Rajbansi and Koch are separate castes." এভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বুকানন হ্যামিলটন সৃষ্ট ভ্রম বিংশ শতাব্দীতে দূরীভূত হল। কিন্তু সহজে এই কাজ করা সম্ভব হয়নি। পঞ্চাননের প্রতিপক্ষ প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। জমিদার, উকিল, মোক্তার পণ্ডিতই কেবল নন, কুচবিহার রাজদরবারের উচ্চপদস্থ আমলাগণও সরাসরি বিরোধিতা করতে লাগলেন। বহু দূর দূরান্ত থেকে মহামিলনে সমাগত জনগণের খাবার ও আবশ্যকীয় বস্তু সংগ্রহের জন্য একটি ক্ষুদ্র বাজার বসেছিল। বিকেলে শোনা গেল দেবীগঞ্জ কাছারি থেকে বরকন্দাজগণ বাজারে এসে দোকানদারদের জোর করে উঠিয়ে দিচ্ছিল — কারও কোন আপত্তি শুনে না।

মহামিলন ক্ষেত্রে গণ্ডগোল দেখে সম্পাদক মহাশয় বাজারে গেলেন। দোকানদারদের আশ্বাস দিয়ে বললেন এ হুকুম ম্যানেজারের নয়।[৯] অনুষ্ঠানে গোলমাল হতে পারে আশঙ্কা করে পঞ্চানন বর্মা আগাম অনুমতি চেয়ে জলপাইগুড়ি ডেপুটি কমিশনার জে. এ. মিলিগানাকে জানিয়েছিলেন। মিলিগান সাহেবও অবিলম্বে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে জানিয়ে ছিলেন।

Babu Panchanan Barma Sarkar

Jalpaiguri
Dated, 8th Febryary, 1913

Dear Sir,

I write to inform you that it is not my intention to interfere with your meeting in any way, I lernt that there may be some opposition to your meeting from other sources; so I consider it my duty to reinforce the Debigunj Police, I shall also be present all the day to-morrow.

I am quite convinced that neither you nor any other organisor of this meeting desire or intend to have any disturbance; but if any opposition should arise, it is possible that your followers might get out of Control.

Do not therefore think that I have sent police to overawe your meeting or be used for any purpose so long as there is no danger of any riot or affray.

Your faithfully,
J. A. Milligun
Deputy Commissioner

১৯১৯ সালেই কোচবিহারেই পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় সমিতির সহিত চরম বিরোধিতার আকার ধারণ করে। রাজ দরবারের উচ্চপদস্থ বর্ণন্দিুরা প্রত্যক্ষভাবে উপবীত অনুষ্ঠানের বিরোধিতা শুরু করেন। তৎকালীন রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুরও নিজে সরাসরি উপবীত গ্রহণের অনুষ্ঠানগুলির ক্ষতি করার চক্রান্তে সামিল হন। কোচবিহার শহর লাগোয়া ডোডেয়ার হাটে তিনি পৈতা নিতে ইচ্ছুক রাজবংশীদের বাধাও দিয়েছিলেন। মাথাভাঙ্গার নায়েব আহেলকার অর্থাৎ মহকুমা শাসক আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে মিলনক্ষেত্রগুলি থেকে সংগৃহীত অর্থাদি রাজকোষে জমা দিতে এবং যেগুলি ইতিমধ্যে ক্ষত্রিয় সমিতির মূল কেন্দ্র রংপুর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলি ফেরত আনার জন্য ফরমান জারি করেছিলেন। এই আদেশ উলঙ্ঘন করলে তার পরিনাম খারাপ হবে। রাজ্য মধ্যে আর মিলন ক্ষেত্র হইতে পারিবে না; ক্ষত্রিয় সমিতির নেতাগণকে ফৌজদারীতে ফেলিয়া ফাটকে দেওয়া হইবে; এবং তাহাদের জমি-জমা খাস করিয়া লওয়া হইবে।[১০] কোচবিহারের রাজ কর্মচারী বৃন্দ এখানে থাকলেন না বরং তৎকালীন স্টেট সুপারিনটেন্ডেন্ট কলিন্স সাহেবকে দিয়ে এক নির্দেশ জারি করেন। ফলে কোচবিহারের কোন কোন অঞ্চলের মিলন ক্ষেত্রগুলির অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। কারণ রাজ সরকারের কাছে অভিযোগ তোলা হয় যে ক্ষত্রিয় সমিতি মূলত কোন সামাজিক সংস্থা নয়, এটি একটি রাজনৈতিক সংস্থা।

কোচবিহার রাজদরবারের সঙ্গে বাধা বিপত্তি দূর করার জন্য তৎকালীন মহারাজা রাজরাজেন্দ্র নারায়ণের হস্তক্ষেপের জন্য রাজভ্রাতা প্রিন্স ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণ মারফত স্টেট সুপারিনটেন্ডেন্টের আদেশ প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেন। ১৩২০ সালের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণ করে মহারাজা ভূপবাহাদুরকে অবগত করান হয় যে সংগঠনটির

সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং তিনি যেন তাঁর সকল স্তরের কর্মচারীকে সমিতির প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের জন্য নির্দেশ জারি করেন।

মিঃ কলিন্স সাহেব মিলন ক্ষেত্রের মাধ্যমে উপরীত গ্রহণের অনুষ্ঠান বাতিল করার আদেশ জারি করেছিলেন তা প্রত্যাহারের বিষয়ে ভিক্টর নিত্যেন্দ্র মহারাজার পক্ষে অক্ষমতার কথা জানিয়ে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেন। টেলিগ্রামটি এইরূপ —

Thank Telegram, His Highness can not withdraw Mr. Collin's order untill it is fully proved you are non political and do not cause any inconvinience whatever to the general Public.

Prince Victor

কোচবিহার ক্ষত্রিয় সমিতির প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি রংপুরে তখন ক্ষত্রিয় সমিতির সংস্কার আন্দোলনকে বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। ১৩২০ সালে কিছু বর্ণহিন্দু নেতা ক্ষত্রিয় সমিতির যজ্ঞোপবীত অনুষ্ঠানগুলি চিরতরে বন্ধ করার জন্য রংপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আবেদনে সারা তো দিলেনই না বরং এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জেলাবাসীকে জানিয়ে দিলেন যে উপবীত গ্রহণের বিষয়ে সরকারের কোন আদেশ নেই এবং নিষেধও নেই।[১১] কিন্তু প্রশ্ন একটা থেকেই যায়। কোচবিহার রাজ্যে বহিরাগত আমলাগণ কেন পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় আন্দোলনের বিরোধিতা করতে শুরু করেছিলেন। এমন নয় যে পঞ্চানন বর্মাই শুধু ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন শুরু করেছিলেন। উনিশ শতকের সাতের দশকে বঙ্গদেশে অনুরূপ বেশ কয়েকটি আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। বর্তমান বাংলাদেশে বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরের চন্ডাল সমাজের নেতৃবৃন্দ ব্রাহ্মণ বা নিদেনপক্ষে নমঃশূদ্র শ্রেণীভুক্ত হবার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। একইভাবে চাষি — কৈবর্তগণও ঐ সময় মাহিষ্য শ্রেণিভুক্ত হবার আন্দোলন করেছিলেন। তাই জয়া চ্যাটার্জি বলেছেন — At roughly the same time, Landowner Rajbansi families in the northern district began to claim Bratya Kshtriya Status and later launched a movement to encourage members of their caste to were the scred thread. After the first census in 1891 the number of such claims increased dramatically and in 1911 petition received

by the census commissioner from different caste association weighed over a maund (821b). But Census operations of ten sparked of caste friction, as high castes were irritated by the ritual perfections of their social inferiors."

যাই হোক একটা বিষয় বলতেই হয় যে পঞ্চানন বর্মা পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয় সমিতি ১৯১৭ সাল অবধি একটি সামাজিক সংস্থা রূপে স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে অরাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে ধরে রাখতে পারেননি। "That the association is non-political and its aim at this intellectual, social, moral and religious progress of the community, and final emancipation of the souls by finding of the great in all we see is the goal."[১৩] ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চিত্রপটের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এমতাবস্থায় তিনি নিজের পুরোনো চিন্তা ধরে না থেকে পরিস্থিতির চাপে সরে আসতে বাধ্য হন।

রংপুরে আসার পর সমাজের উন্নতির জন্য সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায় করার ব্যাপারে এবং রংপুর প্রশাসনের সাথে যোগাযোগের ফলে তার যোগ্যতা ও প্রতিভার দ্বারা ক্রমে সমাজের উচ্চতর আসনে পৌঁছতে পেরেছিলেন। ১৯০১ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত রংপুর তথা দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনার উদ্ভব হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূচনা। ১৯১০ সালে ক্ষত্রিয় সমিতির প্রতিষ্ঠা। ১৯১৬ সালে কারমাইকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা, ১৯১৭ সালে রংপুর জমিদারদের উদ্যোগে জমিদার সমিতি প্রতিষ্ঠা। তার উপর বিশ্বযুদ্ধ, অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন — এসবই ঘটেছিল পঞ্চাননের রংপুরে অবস্থিতির দুই দশকের মধ্যে। পঞ্চানন বর্মা প্রথম জীবনে কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে যুক্তছিলেন। (বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি) রংপুর জেলার প্রতিনিধি হিসেবে রায় সাহেব উপস্থিত ছিলেন। রংপুর জেলা থেকে আরো যাঁরা প্রতিনিধি হিসেবে ঐ কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন জমিদার যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, নৃপেন্দ্রচন্দ্র রুদ্র, বাবু উমাকান্ত দাস, সতীশচন্দ্র দাস প্রমুখ এখানে উল্লেখ্য যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিই ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের শাখা। এ সময়ে বঙ্গদেশে কংগ্রেসের আলাদা কোন প্রাদেশিক শাখা ছিল না।[১৪] কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি কেন কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিলেন সে কথা তাঁর জীবনীকারগণ কেউ লেখেননি। রায় সাহেবও

কোনও কারণ লিখে যাননি।

পঞ্চাননের রাজনৈতিক কৌশল তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করা। বর্ণহিন্দুদের ভিতকে দুর্বল করার জন্য সরকারও তাদের দাবিসমূহের প্রতি ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করে। বর্ণহিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়েও শুধুমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতার বলে সরকারের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে একচেটিয়া আধিপত্য লাভ করে। উক্ত প্রতিষ্ঠানে সুযোগ লাভের ফলে বর্ণহিন্দুরা শুধু নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের উপরেই নয় মুসলমান সম্প্রদায়ের উপরও মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচার করে।

১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ডের সংস্কার আইনের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য স্থানীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করেন। শাসন সংস্কার বিষয়ে রায় সাহেব সরকারের কাছে দীর্ঘ এক চিঠি লেখেন। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার আইনের বলে রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতি যা এতদিন ছিল রাজবংশীদের সামাজিক মর্যাদা লাভের লড়াই - তা পরে পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে রংপুর জেলার মুসলমান এবং বর্ণহিন্দুরা দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে কিন্তু রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐ সমস্ত আন্দোলন থেকে দূরে থাকেন। বর্ণহিন্দু এবং মুসলমান সমাজের লোকেরা তাদের নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায়নি। পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় সমিতি সেদিন না থাকলে রাজবংশী হিন্দুরা সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও আসামে বর্ণহিন্দুর প্রত্যক্ষ আশ্রয়ে রাজনৈতিক নাবালক হিসেবে পরগাছা হয়ে সমাজে বেঁচে থাকতেন।

ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশরা জড়িয়ে পড়ে। ফলত বিশ্ব রাজনীতিতে এর প্রভাব পড়ে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে পরিবর্তনের সঙ্গে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক চিত্রপটের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পরিবর্তনের ধারাকে বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা (উচ্চবর্ণের রাজকর্মচারী) কুক্ষিগত করে রাখে। Bloomfield লক্ষ করেছেন যে ভদ্র লোকেরা নির্দেশ দিয়েছিলেন কোন পথে ভোটদান বা ভোটদানের যোগ্যতা এবং কোন পদ্ধতি করা যাবে। ভদ্রলোকেরা কিন্তু সচেতন ছিলেন যাতে করে ১৯১২ সালের মতো অপ্রস্তুত অবস্থা না হয়। লক্ষ লক্ষ ভোটাধিকারী যাদের মধ্যে বেশির ভাগই গ্রাম্য অশিক্ষিত ব্যক্তি।[১৭]

১৯১৯ সালে ভারত শাসন প্রবর্তিত হওয়ায় নির্বাচনে ভোটদানের

এবং আইন সভার সদস্য হবার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। আইন সভায় অংশ গ্রহণের প্রধান যোগ্যতা ছিল আয়কর ও রাজস্ব প্রদানের উপর। যারা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়কর বা রাজস্ব প্রদানের করতেন কেবল তারাই ভোট দানের অধিকারী ছিলেন এবং সদস্যও নির্বাচিত হতে পারতেন। ১৯১৯ সালেও এই আইন বলবত ছিল তবে করের পরিমাণ হ্রাস করার ফলে সাধারণ মানুষও আইন সভায় প্রবেশের অধিকার লাভ করেন। এ সংস্কার আইনের বিধান মতে প্রদেশে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা গঠিত হয় এবং সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয় ১৩৯ জন যার মধ্যে ২৬ জন মনোনীত। ১১৩ জন নির্বাচিত তার মধ্যে মুসলমান ৩৯ এবং হিন্দু ৪৬ এবং অপরাপর কোটায় ২৮ জন।[১৮] ১৯১৯ সালের ব্যবস্থা অনুসারে নির্বাচন মন্ডলীগুলোকে মুসলমান ও অমুসলমান ভাগে ভাগ করা হয়। কিন্তু নিম্নবর্গীয় জাতির জন্য কোন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। রংপুর জেলায় দুটি অসংরক্ষিত আসন ছিল এবং একটি অমুসলমান কেন্দ্র ছিল। ১৯১৯ সালের সংস্কার আইনে ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচন রংপুরের বর্ণহিন্দুদের নতুন সমস্যায় ফেলে দেয়। ১৯০৫ সালের পর থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত বাংলা প্রদেশের (হিন্দু বনাম মুসলমান) সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে এবং পরবর্তী বর্ণ ভিত্তিতে (বর্ণ হিন্দু বনাম তপশিলি) নির্বাচন রংপুরে রাজনৈতিক মেরুকরণ শুরু হয়। এতদিন যাদের নিম্নবর্গ এবং অশিক্ষিত বলে হেয় করে আসছিলেন নির্বাচনের মাঠে তাদের পাল্লাভারীতে বর্ণহিন্দুদের শিবিরে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। (এখানে উল্লেখ্য যে তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের শতকরা ষাট ভাগ ছিল বলেই আতঙ্ক সৃষ্টি করে) রংপুরে তখন দুজন মাত্র রাজবংশী উকিল ছিলেন, পঞ্চানন বর্মা এবং ক্ষেত্রমোহন সিংহ। এই নির্বাচনে ২ জন সদস্য পদের জন্য ৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ক্ষত্রিয় সমিতি অমুসলমান কেন্দ্রে পঞ্চানন বর্মাকে প্রার্থী করেন। অন্য একটি কেন্দ্রে ক্ষেত্রমোহন সিংহ প্রার্থী হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় শ্রী যোগেশচন্দ্র সরকার ক্ষত্রিয় সমিতির সমর্থন চাওয়ায় ক্ষত্রিয় সমিতি সমর্থন করে। শ্রী যোগেশচন্দ্র সরকার রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত না হওয়া সত্বেও ক্ষত্রিয় সমিতি সমর্থন করে উদারতার পরিচয় দিয়েছিল। অন্য দুজন ব্যক্তি আশুতোষ লাহিড়ী অবসর প্রাপ্ত রংপুর জেলা ইঞ্জিনিয়ার অন্যজন রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি রংপুরের উকিল। উপরোক্ত চারজন ব্যক্তির মধ্যে তিনজনই ছিলেন বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের। একমাত্র পঞ্চানন বর্মাই ছিলেন রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত। ১৯২০

সালের অক্টোবর মাসে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে পঞ্চানন বর্মা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন এবং যোগেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ও নির্বাচনে জয়লাভ করেন।" ১৯১৯ সালের নির্বাচনী এলাকার জন্য ভোট পরিসংখ্যানে জানা যায় রংপুর জেলায় অমিউনিসিপাল এলাকায় ভোটের জন্য যোগ্য বিবেচিত ব্যক্তির সংখ্যা ৫৪১৯০ এবং অমুসলমান ২৮৪৬৭ অর্থাৎ যথাক্রমে (৫২.৫৪ এবং ৪৭.৪৬)। আর উক্ত ২৮৪৬৭ জন অমুসলমান ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটাররাই ছিল ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের।"[৮] ১৯২০ সালের নির্বাচনে পঞ্চানন বর্মার জয়লাভ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। মাত্র এক দশকে বর্ণহিন্দুদের পরাজিত করায় রাজনীতির সমীকরণ পাল্টে যায়। যারা পরাজিত হয়েছিলেন তারা কিন্তু সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব।

১৯১৯ সালের বিধান অনুসারে তিন বছর অন্তর বিধান পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৩ সালে সারা ভারতে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনে ব্যস্ত থাকায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। ইতিমধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস স্বরাজ্য দল গঠন করেন এবং কংগ্রেসের অনুমতি নিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। সে সময় দেশবন্ধুর জনপ্রিয়তা ছিল গগনচুম্বী। ক্ষত্রিয় সমিতি প্রার্থী নির্বাচন করার জন্য সংসদের সভা আহ্বান করেন। বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে কুড়িগ্রামের জোতদার সভার দুজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা এবং নগেন্দ্র নারায়ণ রায়কে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়। পঞ্চানন বর্মা রংপুর সদর এবং নিলফামারী মহকুমা নিয়ে গঠিত রংপুর পশ্চিম কেন্দ্রে এবং পূর্ব থেকে নগেন্দ্র নারায়ণ রায়। যদিও এই মনোনয়ন সুষ্ঠভাবে গৃহীত হয়নি। কারণ ক্ষেত্রমোহন সিংহ নির্বাচন প্রার্থী হবার জন্য আবেদন করেন কিন্তু সমিতি ক্ষেত্রমোহন সিংহকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেননি। ফলে শ্রী ক্ষেত্রমোহন সিংহ প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়ে নগেন্দ্রনাথ রায়ের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী রূপে পশ্চিম কেন্দ্রে ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এবারের নির্বাচনে ৫ জন প্রার্থী ছিলেন। ১) পঞ্চানন বর্মা ২) নগেন্দ্রনারায়ণ রায় ৩) বিজয়চন্দ্র দাস (স্বরাজ্য পার্টি) ৪) ক্ষেত্রনাথ সিংহ (নির্দল) এবং ৫) যোগেশচন্দ্র সরকার (নির্দল প্রার্থী) যিনি ১৯১৯ এর নির্বাচনে ক্ষত্রিয় সমিতির সমর্থনে জয়লাভ করেছিলেন। এ নির্বাচনে ক্ষত্রিয় সমিতির দুজন প্রার্থীই বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন এমনকি দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলও পরাজিত হয়। এই নির্বাচনে কোন কংগ্রেস প্রার্থী না

থাকায় বর্ণহিন্দু কংগ্রেসীরা স্বরাজ্য দলের প্রার্থীকে ভোট দেন।" দিনাজপুর কেন্দ্রে ক্ষত্রিয় সমিতির পক্ষে প্রেমহরি বর্মা স্বরাজ্য দলের প্রার্থী যোগিন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর কাছে পরাজিত হন। নির্বাচনে অসংগতি থাকার জন্য প্রেমহরি বর্মা মামলা করেন এবং পরে তিনি মামলা তুলে নেন।" এই ব্যবস্থাপক সভায় চিত্তরঞ্জন দাসের প্রভাবে বাংলার অনেকগুলি আসন স্বরাজ্য দল দখল করে নেয়। ফলে এবারের কাউন্সিলে সরকার ও স্বরাজ্য দলের মধ্যে অনবরত শক্তি পরীক্ষা চলতে থাকায় কোন কাজ করা সম্ভব হয়নি।

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে রংপুর জেলার অমুসলমান কেন্দ্রগুলি পুনর্বিন্যাস করা হয় এবং রংপুর কেন্দ্রকে দুভাগে ভাগ করা হয়। রংপুর সদর এবং নিলফামারী মহকুমা নিয়ে রংপুর পশ্চিম এবং গাইবান্দা ও কুড়িগ্রাম নিয়ে রংপুর পূর্ব কেন্দ্র গঠন করা হয়। ক্ষত্রিয় সমিতির প্রার্থীরূপে রংপুর পূর্ব কেন্দ্রে পঞ্চানন বর্মা এবং রংপুর পশ্চিম কেন্দ্রে নগেন্দ্রনারায়ণ রায় ক্ষত্রিয় সমিতির প্রার্থী হন। এবারও এই নির্বাচনের মনোনয়ন নিয়ে ক্ষেত্রমোহন সিংহের সঙ্গে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। এই বিরোধীতা কারণ কিন্তু অজানাই রয়ে গেছে। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট যে নির্বাচনী রাজনীতি ক্ষত্রিয় সমিতির মধ্যে সংহতির পরিবর্তে বিরোধের ক্ষেত্র তৈরি করতে শুরু করে। রংপুর পূর্ব কেন্দ্রে পঞ্চাননের বিরুদ্ধে প্রার্থীরূপে দাঁড়িয়েছিলেন কুড়িগ্রামের উকিল যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং রংপুর পশ্চিমকেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী নলিনীমোহন রায় চৌধুরী। এবারের নির্বাচনে পঞ্চানন বর্মা ফাইলেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ থাকায় নির্বাচনের প্রচারে বের হতে পারেননি। রায় সাহেব শয্যাশায়ী থাকা অবস্থায় একদিন নলিনীমোহন রায় চৌধুরী ক্ষত্রিয় সমিতির বিতর্কিত ব্যক্তি ক্ষেত্রমোহন সিংহের মাধ্যমে এক প্রস্তাব পাঠান। সেই প্রস্তাব অনুসারে শ্রী নগেন্দ্রনারায়ণ রায় যদি রংপুর পশ্চিম কেন্দ্র থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন তাহলে নলিনীমোহন রায় চৌধুরী ক্ষত্রিয় সমিতিতে ১৫০০০ টাকা দান করিবেন। রায় চৌধুরীর প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য সমিতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের রংপুরে আহ্বান করেন। উক্ত প্রস্তাবের মতামত জানবার জন্য নেতৃবর্গ সকলে মিলে পঞ্চাননের কাছে গেলে তিনি অনেক কষ্টে বলেন, "আমার অবস্থা ঞমত? এখন আপনারা যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহা করুন। তবে একটা কথা, টাকা পয়সা দিয়ে মান কেনা যায় না!"[১১] রায় সাহেবের এই কথা কয়েকটি

নেতৃবৃন্দের অন্তরে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় বিশেষ করে ডিমলা নিবাসী কামিনীকুমার সিংহ রায়ের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তাঁরা এক বাক্যে এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে নির্বাচনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৬ সালে ডিসেম্বর মাসে ফলাফল ঘোষণা করা হলে দেখা যায় পশ্চিম রংপুর কেন্দ্রে নগেন্দ্রনারায়ণ রায় বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন কিন্তু রায় সাহেব পূর্ব রংপুর কেন্দ্রে পরাচিত হন। নির্বাচনে নানা প্রকার অসংগতির বিরুদ্ধে রায় সাহেব মামলা করেন। বে-আইনি কার্যকলাপ প্রমাণ করতে না পারায় মামলায় পরাজিত হন।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৯ সালের জুন মাসে। এবারের নির্বাচনের পটভূমি বিগত নির্বাচনগুলির থেকে আলাদা কারণ কংগ্রেস দল বিভিন্ন ইস্যুতে মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়। বিশেষ করে নেহেরু রিপোর্টে মুসলমানদের যে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব দেবার কথা বলা হয়েছে তাকে কংগ্রেস অস্বীকার করে। অন্যদিকে কংগ্রেস দল সরকারের উপর প্রস্তাবিত রোয়েদাদ (Comminal Award) বাতিলের জন্য চাপ দেয়। ফলে কংগ্রেস চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন বয়কট করে। এবার রংপুর পূর্ব এলাকায় (কুড়িগ্রাম-গাইবান্দা) নগেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এবারও ক্ষত্রিয় সমিতির নমিনেশন না পেয়ে ক্ষেত্রমোহন সিংহ নগেন্দ্রনারায়ণের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন।[২২] রংপুর আসনে (রংপুর সদর ও নীলফামারী) মহকুমা নির্দল প্রার্থী ড. অতুলচন্দ্র সাহা পঞ্চাননের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিপুল ভোটে পরাজিত হন।[২৩] যা হোক ১৯১৯ সালের সংস্কার আইনের এটাই ছিল শেষ নির্বাচন।

লন্ডন ও দিল্লীর ব্রিটিশ নীতিনির্ধারকেরা ১৯২৯ সালের দিকে মনে করেন যে দশ বছর আগে মন্টেগু ও চেমস্‌ফোর্ডের নির্ধারণ করা শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল্যায়ণ হওয়া প্রয়োজন। গত দশকের বিভিন্ন চাপের ফলে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কেন্দ্রের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকদের চাপ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারের সাথে ভারতীয়দের সহযোগিতার ভিত্তি প্রসারিত করা। এই সংস্কারের ফলে ভারতীয়দের হাতে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়। কৌশলগত কারণে কেন্দ্রে ব্রিটিশ শাসন কিছুটা শিথিল করা হয়। কিন্তু আসল ক্ষমতা তাদের হাতেই থেকে যায়।

একই সাথে প্রদেশগুলিকে দেওয়া "বৃহত্তর স্বয়ত্ব শাসনের" সুযোগকে সীমিত করতে বেশ কয়েকটি রক্ষা কবচের পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৩২ সালের সম্প্রদায়গত বোয়েদাত ছিল ঐ কৌশলের একটি অখন্ডরূপ।[২৪] অন্যান্য রক্ষা কবচের মধ্যে ছিল বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের ব্যাপারে গভর্নরের (কাউন্সিলে) ভূমিকা এবং ৯৩ ধারার বিধান — ঐ বিধান মোতাবেক প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার বাতিল করা এবং প্রদেশকে গভর্নরের শাসনাধীনে আনা যেত।[২৫]

পরপর চারটি নির্বাচনে জয়লাভ করে রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা নিজেদের অবস্থানে সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে যান। কিন্তু এই আন্দোলন রংপুরভিত্তিক হওয়ার কারণে উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলির প্রতি ক্ষত্রিয় সমিতির নেতৃবৃন্দের অবহেলার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন ১৯২১ সালে জলপাইগুড়ি জেলার রাজা প্রসন্নদেব রায়কত নির্দল প্রার্থীরূপে জয়লাভ করলেও ক্ষত্রিয় সমিতি প্রসন্নদেব রায়কতকে রাজবংশী বলে স্বীকার করেন নি। কারণ প্রসন্ন দেববের পূর্বপুরুষ কুচবিহার রাজবংশধর বলে। আরো উল্লেখ্য যে কুচবিহারের রাজাদের ক্ষত্রিয় বলে নেতৃবর্গ স্বীকার করতে চাননি। দিনাজপুর জেলার চিত্র ছিল আলাদা ধরনের। সেখানকার স্থানীয় জমিদার, জোতদার, ব্যবসাদারগণ ছিলেন উচ্চবর্ণের। সাধারণ লোকের উপর প্রভাব ছিল অপরিসীম। কিন্তু জেলার অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল রাজবংশী সম্প্রদায়ের।

"But this numerical majority failed to be a decisive factor in the election which was determind by other factors and calculations. The Rajbasi leaders had there fore legilimate reasons to be disatisfied with the existing state politics. Their repeated appeals to their members to vote for their candidates of their own community on these who supported their demands to bring the desired rasults.[২৬]

In such circumstences the only hope to get justice from the government, whom they now requested to nominate their members to different representative bodies." [২৭]

এই সময়ে লন্ডন ও দিল্লীর ব্রিটিশ নীতি নির্ধারকেরা ১৯২৯ সালের দিকে মনে করেন যে দশ বছর আগে মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ডের নির্ধারণ করা শাসনতান্ত্রিকব্যবস্থার মূল্যায়ণ হওয়া প্রয়োজন। গত দশকের বিভিন্ন চাপের

ফলে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্রের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকদের চাপ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারের সাথে ভারতীয়দের সহযোগিতার ভিত্তি প্রসারিত করা এই সংস্কারের এই উদ্দেশ্য ১৯২৮ সালে ভারতবর্ষে শাসন পরিচালনার জন্য এবং সংবিধান রচনার জন্য সাইমন কমিশনকে ভারতে পাঠান। কংগ্রেস এই কমিশন বয়কট করে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের দলিত নেতা ডঃ বি. আর. আম্বেদকর অনুন্নত শ্রেণীর স্বার্থে কমিশনের নিকট দাবিপত্র পেশ করেন। এই দাবিপত্রে অনুন্নত জাতি সমূহকে তপশিলি জাতিভুক্ত করার দাবি জানান এবং নির্বাচনে সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং পৃথক নির্বাচক মন্ডলীর দাবি করেন।

অনুন্নত সম্প্রদায়ের স্বার্থ এবং অতিরিক্ত ক্ষমতার দাবির ভিত্তিতে সরকার সংবিধানের কিছু পরিবর্তনের জন্য 'Indian Statutory Commission' গঠন করেন। ক্ষত্রিয় সমিতি কমিশনের নিকট অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ এবং সুপারিশগুলিকে সুরক্ষার জন্য দাবি জানান। "There should be separate electorate for them to be representedly members belonging to the backward classes. Apart from this representation of the minorities was also to be secured in the local bodies and for the advancement the Depressed classes or Backward classes jobs to be reserved in various services."[২৮] প্রাদেশিক আইন সভায় বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়কে নিয়োগের নির্দেশিকা তৈরি করার জন্য সরকার ১৯৩০ সালে ভোটাধিকার সংস্কারের জন্য "Franchise Reform Committee" নিয়োগ করেন। ক্ষত্রিয় সমিতির পক্ষ থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সংস্কারের সংস্কার আধিকারিককে এক চিঠিতে লেখেন যে রংপুর, জলপাইগুড়ি এবং দিনাজপুরে দুটি করে সাধারণ আসন এবং দুটি করে তপশিলিভুক্ত আসন রাখতে হবে।[২৯]

ইতিমধ্যে সাইমন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার লন্ডনে গেলে টেবিল বৈঠক আহ্বান করেন ১৯৩০, ১৯৩১ এবং ১৯৩২ সালে। ১৯৩১ সালে গোল টেবিল বৈঠকে তপশিলি সম্প্রদায়ের জন্য প্রথম স্বতন্ত্র নির্বাচক মন্ডলীর বিষয়টি আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয় তখন গান্ধীজি এই বলে হুমকি দিয়ে আপত্তি তোলেন যে "আমার যতটা আধিপত্য

আছে ততটা গুরুত্ব দিয়ে বলছি যে, একমাত্র আমি যদি একাই বিষয়টির প্রতিরোধ করি তাহলে আমি আমার জীবন দিয়ে তা প্রতিরোধ করব।"[৩০]

প্রথমে এই হুমকি উপেক্ষা করা হয় এবং তপশিলি সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচক মন্ডলীর বিধান রোয়েদাদে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। অনুন্নত শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ বি. আর. আম্বেদকর, মহম্মদ আলি জিন্না এবং গান্ধীজি। ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা ঘোষণা যখন করা হয় গান্ধীজি তখন জেলে। ১৯৩২ সালের ২০ শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজি রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আমরণ অনশন। গান্ধীজির অনশন তপশিলি হিন্দু সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচন আইন (Separate Electorate) পরিবর্তনের জন্য। গোলটেবিল বৈঠকের সামগ্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নয়, অথবা স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে - এই অনশন শুধুমাত্র হিন্দুয়ানা রক্ষার্থে।

বর্ণপ্রথা ও অস্পৃশ্যতার প্রশ্নে গান্ধীজির ধারণা তপশিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে ক্রমবর্দ্ধমান স্পষ্টবাদী রাজনীতিকদের দৃঢ়বিশ্বাসের বিপরীত ছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই সব রাজনীতিক এই বক্তব্যকে চ্যালেন্স করতে শুরু করে যে তপশিলি সম্প্রদায় হিন্দু সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু প্রভাবিত রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের একীভূত হওয়ার বিরুদ্ধে তারা চ্যালেন্স প্রদান করে।[৩১]

হিন্দু মুসলমান, হিন্দু শিখ এবং খ্রিস্টানদের মধ্যেকার মনোমালিন্য হিন্দু ও অস্পৃশ্যদের মধ্যেকার মনোমালিন্যের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই মনোমালিন্য ব্যাপক গভীর। হিন্দু ও মুসলমানদের মনোমালিন্য ধর্মীয়-সামাজিক নয়। আর হিন্দু ও অস্পৃশ্যদের মনোমালিন্য ধর্মীয় ও সামাজিক। ক্ষমতা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কাছে হস্তান্তরিত হতে যাচ্ছে সেহেতু কিছুটা হলেও রাজনৈতিক রক্ষা কবচ থাকতে হবে। মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে যে সুবিধা ভোগ করে তার চেয়ে বেশি না হলেও কিছুটা সুবিধা দিতে হবে।[৩২]

তপশিলি সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনমন্ডলী সৃষ্টিতে গান্ধীজির অস্বীকৃতির পরিণাম হল পুনা চুক্তি। গান্ধীজির জেদাজেদির বিরুদ্ধে আম্বেদকর কিছুদিন নিজের অবস্থানে স্থির থাকলেন কিন্তু গান্ধীজি তাঁর আমরণ অনশন অব্যাহত রাখলে আম্বেদকর নরম হতে বাধ্য হলেন, কারণ "While Gandhi was fast there were threat from Hindus to

Ambedkar's life. They put out alarming reports that Gandhi would die. Blame would be put on Ambedkar. Gandhi's wife Kasturba went to Ambedkar's house and holding her ... implored. She begged him to save him by withdrawing his stand. Ambedkar told Kasturba that he would never asked Gandhi to go on fast, and as such there was no point in her coming to him to save Gandhi's life.''[৩২] এমতাবস্থায় দেশের স্বার্থে এবং গান্ধীজির জীবনের নিরিখের কথা ভেবে অনুন্নত শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে ড. আম্বেদকর অনিচ্ছা সত্ত্বেও রফা করতে বাধ্য হলেন। ইহাই পুনা চুক্তি নামে খ্যাত। এই চুক্তির ফলে ড. আম্বেদকর পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর দাবি পরিত্যাগ করেন।

প্রবীণ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে এম. সি. রাজার নেতৃত্বে তপশিলি সম্প্রদায়ের নেতাদের সহযোগিতায় প্রণীত পুনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এম. সি. রাজা মনে করেন ''সংখ্যালঘু চুক্তির অন্যান্য স্বাক্ষরকারীরা তার সম্প্রদায়কে পথে বসিয়েছে এবং এখন তার সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংরক্ষিত আসনসহ যৌথ নির্বাচনে যাওয়া উচিত।''[৩৩] এই চুক্তি স্বাক্ষরকারীরা তপশিলি সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের জন্য হিন্দু আসনের ভিত্তিতে সব হিন্দু ও তপশিলি সম্প্রদায়ের লোক ভোটের অধিকারী এবং যৌথ ভাবে তারা নির্বাচন করবেন বর্ণ হিন্দু ও তপশিলি সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের সঙ্গে। বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দু আসনের ভাগ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। বাংলায় আশিটি আসনের মধ্যে ত্রিশটি আসন তপশিলি সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত হয়। চুক্তিটি যখন স্বাক্ষরিত হয় তখন কোন বাঙালি বর্ণহিন্দু সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

এই চুক্তির ফলে বর্ণহিন্দুদের প্রতিক্রিয়া অবিশ্বাস্য উত্তেজনা, ক্ষোভে পরিণত হয়। কাউন্সিলে এন. সি. সেনগুপ্ত এই চুক্তিকে চিহ্নিত করেন ''রাজনৈতিক মূর্খতার কীর্তিস্তম্ভ বলে।'' জে. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ণনা করেন ''এই চুক্তিকে বাঙালীদের উপর অন্যায় ও অস্বাভাবিক অবিচার করা হয়েছে। এতেই ক্ষান্ত থাকেন নি বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়। আসন্ন সংস্কারের প্রেক্ষাপটে বাঙলার হিন্দুদের প্রয়োজন ও দাবি সম্পর্কে আলোচনার জন্য অ্যালবার্ট হলে হিন্দু নাগরিকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শরৎচন্দ্র বসু, জে. এন. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রিটিশের প্রতি অনুগত ভারতীয় বেসামরিক লোকদের মধ্যে

বাঙলার সর্বোচ্চ মর্যাদার কর্মকর্তা বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, হিন্দু মহাসভার ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এবং নসিপুরের জমিদার বাহাদুর যোগদান করেন। 'বেঙ্গল এন্টি কমিউনাল এওয়ার্ড মুভমেন্ট' সংগঠনের কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেস নেতা নলিনাক্ষ সান্যাল, তুলসীচরণ গোস্বামী ও দেবেন্দ্রলাল খান, বি.সি. চ্যাটার্জি এবং অনেক অনুগত মহারাজা''[৩৪] তাই জয়া চ্যাটার্জি বলেছেন, "In Bengal the effect of the fact was drastically to reduce the caste Hindu proportion of seats in the proposed legislature from about 32% to 20%. Bhadrolok Hindus reacted with disbelive shock and anger."[৩৫] আসলে পুনা চুক্তি দলিত মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বড় বাধা গান্ধিজি। তাই ড. আম্বেদকর ম্যাকডোনাল্ডকে লিখেছিলেন "Do you realise that if your decision stands and the constitution come into being you arrests, the marvelous growth of Hindu Reforms who have dedicated themselves to the uplift of their supressed brethren in the every walk of life."[৩৬]

ইতিমধ্যে জোয়ারের জলের মতো জাতীয়তাবাদী দলের উত্থান ঘটেছে। সেগুলিকে প্রতিরোধ করার জন্য সরকার নতুন ভাবনা চিন্তা করতে লাগল। সুতরাং একটা বিশেষ জাতির সমর্থন আদায়ের জন্য চেষ্টা করতে লাগল। "The rising tide of nationalist upsurg made the government search for a counter force to steem this tide. It therefore looked for a social support base with indigenous society, by initiating a policy of promotion and protection of the interest of the lower castes, the government now sought to use them as a counter force against the socially and politically dominent upper castes."[৩৭] ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক সরকার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিবাদের সুযোগ নিয়ে হিন্দুদের রাজনৈতিক উত্থানে বাধা দেবার জন্য মুসলমানদের মদত দিতে আরম্ভ করে। ঔপনিবেশিক শাসকদের মুসলিম তোষণনীতি গ্রহণ করার ফলে নিম্নবর্গীয় মানুষদের সঙ্গে একটা সংঘাতের সৃষ্টি হয় এবং সরকারের প্রতি অনমনীয় মনোভাবের সৃষ্টি করে। ১৯০৯ সাল থেকে বিভিন্ন প্রকার সংস্কার গ্রহণের

ফলে জাতিগত অভিন্নতা সম্বন্ধে রাজনীতির ক্ষেত্রে এক আলাদা পথের অনুসন্ধান করতে শুরু করে। বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন প্রকার জাতিগত সংগঠন সৃষ্টির ফলে এবং তাদের দাবিসমূহ সমসাময়িক রাজনীতিতে প্রতিফলিত হতে লাগল। নিম্নবর্গীয় জাতির সংগঠনগুলি উচ্চবর্গীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের একছত্র প্রাধান্যের প্রতি প্রতিবাদে সোচ্চার হয় — বিশেষ করে চাকুরী, শিক্ষা এবং বিভিন্ন উপদেষ্টা বোর্ডগুলির ক্ষেত্রে। নিজেদের শক্তির উপর তারা ঔপনিবেশিক সংস্থগুলোর ওপর আঘাত হানতে আরম্ভ করল। কারণ ঐ সংস্থাগুলি উচ্চবর্গীয় ব্যক্তিদের দ্বারা কুক্ষিগত ছিল। এভাবেই উচ্চবর্গীয় শ্রেণীর সঙ্গে নিম্নবর্গীয় ব্যক্তিদের মধ্যে বিভেদের সূচনা হয়। রাজবংশী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এই রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। বিশেষ করে রাজবংশী সমাজের শিক্ষিত জমিদার, জোতদার এবং ধনবান ব্যক্তিবর্গ। এদের মধ্যে সর্বজন শ্রদ্ধেয় হরিমোহন রায় খাজাঞ্চী, পঞ্চানন বর্মা, নগেন্দ্রনারায়ণ রায়, প্রেমহরি বর্মা, উপেন্দ্রনাথ বর্মন, মনহর বর্মন, ক্ষেত্রনাথ সিংহ এবং আরো অনেক। নিম্নবর্গীয় সংস্থাগুলির চাপে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ঔপনিবেশিক সরকারের পক্ষ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অদেশ করেন নিম্নবর্গীয় জাতিগুলির কোন কোন বিশেষ সুবিধা প্রয়োজন তার একটি তালিকা তৈরি করা এবং কী কী পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে একটি নির্দেশনামা তৈরি করা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৮৪ সালে ২১ টি অনুন্নত শ্রেণীর তালিকা প্রকাশ করে কিন্তু এই তালিকায় নিম্নশ্রেণীর জাতির সূত্র এবং মানদন্ড সম্পর্কে কোন সঠিক বিবরণ ছিল না। রাজবংশী নেতৃবর্গ, শিক্ষা, অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ জাতীয় তালিকাভুক্ত করার দাবি করেন।

সম্প্রদায়গত রোয়েদাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আসন বন্টন। অনুন্নত শ্রেণিসহ হিন্দুদের দেওয়া ৮০ টি আসন। মোট আসনের শতকরা ৩২ ভাগ। অথচ ১৯৩২ সালের আদমসুমারিতে বাঙলায় তাদের সংখ্যা ছিল ২২.২ মিলিয়ন বা শতকরা ৪৪ ভাগ। জনসংখ্যা অনুপাতে সামান্য কম হলেও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকেও অবমূল্যায়ন করা হয়। ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে বাঙলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ২৭.৮ মিলিয়ন অর্থাৎ শতকরা ৫৪ ভাগ।[৫৮]

আসন বন্টনে দেখা যায় হিন্দুরা ন্যায্যভাবে যতটা আসন আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক কম আসন দেওয়া হয়েছিল। এটা বাস্তব যে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের আসন সংখ্যা অনেক বেশি। দ্বৈত শাসনে বেঙ্গল কাউন্সিলে হিন্দুরা পায় ৭৬ আর মুসলমানেরা পায় ৩৯ টি আসন।[৫৯] একটা মাত্র আঘাতের মধ্যে দিয়ে এই অবস্থার পরিবর্তন করা হয়। তদুপরি ৮০ টি আসনের মধ্যে কমপক্ষে ১০ টি আসন সংরক্ষিত করা হয় অনুন্নত শ্রেণীর জন্য। এর ফলে ২৫০ আসন বিশিষ্ট হাউসে হিন্দু আসনের সংখ্যা আরো কমে দাঁড়ায় ৭০ অর্থাৎ শতকরা হিসেবে মাত্র ২৮ ভাগ। বাস্তবে সম্প্রদায়গত রোয়েদাদের আইন সভায় বাঙালিদের দুর্বল সংখ্যালঘিষ্টে পরিণত করা হয়।

এভাবে ক্রমাগত রোয়েদাদ সম্পর্কে বিভক্তিমূলক প্রতিক্রিয়া আসতে থাকে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুরা একই সুরে বিরোধিতা করে আর মুসলমানেরা এর সমর্থনে ক্রমাগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এভাবে রোয়েদাদ হয়ে পড়ে বিভক্তি ও বিবাদের কেন্দ্রবিন্দু।

পুনা চুক্তি পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় শাসন সংস্কারের উপর সাইমন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে গোলটেবিল আলোচনার পর ব্রিটিশ সরকার ভারত ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়ে যুক্তরাজ্য (Federation of British India and the Indian States) গঠনের প্রস্তাবে ১৯৩৩ সালের ১৫ ই মার্চ একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। উক্ত শ্বেতপত্রের ওপর বিধান পরিষদে Special Mention under Sector 78 আলোচনা হয়। ৩ রা এপ্রিল ১৯৩৩-এর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মিঃ জে. এল. সেনগুপ্ত, মিঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, খান বাহাদুর মহম্মদ আব্দুল মোসিন, রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা, মিঃ ডাব্লু. ডি. আর. প্রিনটিস, আই. সি. এস. (অবসর প্রাপ্ত) এবং মিঃ ডাব্লু. এইচ. থমসন প্রমুখ সদস্যগণ। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জে. এল. সেনগুপ্ত, আব্দুল মোসিন প্রমুখ সকলে প্রস্তাবের সমালোচনা করেন এবং এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারকে নতুন ভাবে চিন্তা ভাবনার পরামর্শ দেন। রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মাও প্রস্তাবে বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচনা করেন কিন্তু পুনা চুক্তিকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন — "The scheduled castes population from a very large proportion of the Hindu population of the different Provinces of India. The provisions for giving the scheduled castes some reserved seats in the legislative Assemblies and the Houses of Assembly, hour wade those

institutions really democratic the Poona Agreement by alloting to the scheduled castes a number of seats approching in proportion to a certain extent, the number of population, has some a great service in the interest of securing the advancements of these castes and the solidarity of the Hindu community. The British Government also are heartly thanked for ready acceptance of the Poona Agreement and correcting their former mistake, committed in the communal Award. Some allempts are even now being made to reduce the number of seats then and now respectively alloted to the scheduled casts. These attempts are having the effect of alienating the scheduled castes and from other castes of the Hindu Community. It would be better if the representatives of the scheduled castes and also those of other Hundus meet together and wake up differences."[৪০]

১৯৩২ সালের পুনা চুক্তির প্রতিক্রিয়ায় All India Depressed class Federation গঠন করা হয় এবং এর সভাপতিত্ব করেন রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা। পঞ্চানন বর্মা অনুন্ন অবিধার পরিবর্তে তালিকাভুক্ত নামকরণের পক্ষপাতি ছিলেন। রাজবংশী নেতৃবৃন্দ শিক্ষা ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদ জাতিকে তালিকাভুক্ত করার দাবি জানান। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজও এই দাবির বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানান — "These castes only can be called depressed who have no Brahamans to perform their religious and social ceremonies. In its openion judge by the criterion, the Rajbansi and other castes could not be included in the list of depressed class." [৪১]

"The Indian Association also observed that the criterion of social and political bakewardnes for inclusion of castes in the list of Depressed classes was not applicable to the Rajbansis. It (Rajbansis) is well represented into the legislature argued the Association. It is well known that this castes has been long been putting themselves forwarded as Kshatriya and wears the thread that the Rajbansi and the other castes should not be excluded from the list." [৪২] হিন্দু মহাসভাও একই ধারণা পোষণ করে। হিন্দু মহাসভার মতে দীর্ঘদিন ধরে

রাজবংশীরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে আসছিলেন এবং পবিত্র পৈতাও গ্রহণ করেছিলেন। অতএব তারা নিজেদের অনুন্নত শ্রেণি বলে দাবি করতে পারে না।[৪৩]

The Bengal Depressed class Association যা ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল - তারা যুক্তি দেখান। কিছু কিছু নিম্নবর্গীয় সংস্থা রাজবংশীদের তালিকাভুক্ত না করার জন্য দাবি করে, আসলে তারা একটা সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করতে চায়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে হঠাৎ করে পঞ্চানন বর্মা অনুন্নত হতে চাইলেন কেন? পঞ্চানন বর্মা জাতপাত-বর্ণে শতধা বিভক্ত হিন্দু সমাজের মধ্যে রাজবংশীদের উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা আদায় করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন — তিনিই পরে আন্দোলন করেন যাতে রাজবংশী সমাজকে অন্যবর্গীয় হিন্দুর সঙ্গে তপশিলি ভুক্ত হিসেবে গণ্য করার জন্য। লেথিয়ান কমিটি তাই বলেছেন, "Rajbansi is well organised community. They want to run with the here and hunt with the hound." পঞ্চানন একটি কষ্টিপাথরে নিজের লক্ষ্য স্থির করতন। তিনি চিন্তা করেছিলেন আত্মিক উন্নতির পথ নিরূপন করেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, বাইরের বা পার্থিব দিকের উন্নতি প্রয়োজন। কেবলমাত্র কৃষি নির্ভরশীল হয়ে কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। তিনি বললেন শিশুকে যেমন হাত ধরে হাটা শেখাতে হয়, অর্থে, শিক্ষায় দুর্বল সমাজকেও সেভাবে অবলম্বন দিতে হবে, যাকে ধরে সমাজ এগিয়ে যেতে পারবে; আর অলম্বন হল, "তপশিলি ভুক্তি"। কারণ তাদের সমস্ত ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের সঙ্গে এক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু Depressed Class শব্দটিকে একটা বিশেষ কলঙ্কচিহ্ন বলে মনে করেন — তাই এর পরিবর্তে Scheduled Class (অনুন্নত সম্প্রদায়) লেখার জন্য অনুরোধ করেন।[৪৪] এ কাজ করতে গিয়ে রায় সাহেবকে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে নানা প্রকার প্রতিবাদ হতে লাগল। কিন্তু হাজার প্রতিবাদ সত্বেও কিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে রাজবংশী জাতির জনক শক্ত হাতে হাল ধরলেন। তার বক্তব্য রাজবংশী সহ আরো কিছু জাতির আর্থ সামাজিক উন্নতিকল্পে Special Protection জরুরী। তবে Depressed Class শব্দদ্বয়ের দ্বারা সামাজিক নিম্নমান্যতা বোঝায় — তাই তিনি Depressed Class এর পরিবর্তে Backward Class নামের পক্ষে সাওয়াল করেন এবং শিক্ষার অনগ্রসর তাকেই Backwardnes

-এর মূল নির্দেশিকা ধরা হয়।

প্রতিবাদ সত্বেও তিনি যুক্তি দেখান — "Without protections and reservation in Politics, education and Administration a backward castes could not improve its social positions merely by capitilazation on Castes Pride." প্রতিবাদীদের পক্ষ থেকে বলা হয় যেহেতু রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতি এবং জাতিগত মর্যাদার দিক থেকে বর্ণহিন্দু, সেহেতু রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের নিম্নবর্গীয় জাতির সঙ্গে একত্রিত করা চলবে না। অবশেষে দিনহাটায় ক্ষত্রিয় সমিতির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে তিনি বলেন যে শিক্ষার বিস্তার এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর হওয়া দরকার। যদি প্রশাসনের সাহায্য গ্রহণ করা না যায় তা হলে শুধুমাত্র ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করে সমাজের উপরের স্তরের ওঠা সম্ভব নয়। এটা সমাজের পক্ষে ক্ষতির কারণ হবে। তিনি স্বজাতিদের বাধা সত্বেও আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে, "ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ পান্ডবেরা হীনবল হয়ে শৌর্যবীর্জ অর্জন করার জন্য দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসে জীবনযাপন করেন। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর রাজবংশী জাতিরও তপশিলি জাতিসমূহের তালিকাভুক্ত হয়ে থাকা প্রয়োজন। এই জীবনযাপন করে এই জাতিকে দেশের অন্যান্য জাতি সমূহের সমগোত্রীয় হওয়ার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। তিনি আরো বলেছেন, "অনগ্রসর সমাজের পক্ষে রাজনৈতিক, শৈক্ষিক, প্রশাসনিক সংরক্ষণ ও সহায়তা ব্যতীত কেবলমাত্র জাত্যাভিমান সম্বল করিয়া জাতির উন্নতি করা সম্ভব হইবে না ..... বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বিদ্যাবুদ্ধিতে ও অর্থের অভাবে যখন পাচকের চাকুরী করে কেহই তাহাকে ব্রাহ্মণের মর্যাদা দেয় না। সুতরাং তালিকা থেকে বাদ গেলে সমূহ ক্ষতি হইবে। যোগ্যতা অর্জনের জন্য সুযোগ গ্রহণের জন্য তালিকাভুক্ত হওয়া প্রয়োজন, তথাপি সমাজের কিছু জনগোষ্ঠী Depress Class -এর তালিকায় নাম লেখা থেকে বিরত থাকার জন্য দাবি করেন। কিন্তু সভার বার্ষিক অধিবেশনে তালিকার পক্ষে দাবি জোরদার করা হয়।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে পঞ্চানন বর্মার এই যুক্তি বঙ্গদেশের রংপুর দিনাজপুর, মালদহ, দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ির রাজবংশী সমাজ গ্রহণ করলেও। আসাম, বিহার, নেপালের নিম্নভাগ ও কুচবিহার রাজ্য তা মেনে নেয়নি। রায় সাহেব তপশিলি ভুক্তির উদ্দেশ্য নিয়ে আসামের রাজবংশী সমাজের সঙ্গে মিলিত হলেন। ধুবরী শহরের রূপসী হাউসে মিটিং হয়।

সিদলির রাজা অজিত নারায়ণ দেব, রূপসীর জমিদার যোগেন মন্ডল (উকিল) ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন। সারারাত ধরে উক্ত বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ চলে; পরিশেষে পঞ্চানন বর্মার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। পঞ্চানন বলেছিলেন, অনেক আশা নিয়ে আসামের রাজবংশী সমাজের নেতৃবর্গের কাছে আসা কিন্তু সব বৃথা হয়ে গেল। আসামের গরীব রাজবংশী সমাজের কোন উপকার তাঁকে দিয়ে হল না।

আসামের নেতৃবর্গের বক্তব্য হল ক্ষত্রিয় সমাজ নীচু শ্রেণীর সমপর্যায়ে আসতে পারে না। ক্ষত্রিয়রা Scheduled Castes হতে যাবে কেন। কোচবিহার রাজ্যেও এ প্রস্তাব গৃহীত না হলেও পশ্চিমবঙ্গ ভুক্তি পর কোচবিহারের রাজবংশী সমাজ তপশিলি জাতিভুক্ত তালিকায় এসে যায়। বিহারের রাজবংশীরা কিন্তু তপশিলিভুক্ত এখনও হয়নি।

আসামের রাজবংশী সমাজ এরপর বিশেষভাবে পর্যুদস্ত। শিক্ষায় রাজনীতিতে সরকারী শাসন ক্ষমতা এবং আর্থিক দিক দিয়ে তাদের অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। বলা যায় এখানকার নেতৃবর্গের দূরদর্শিতায় কোথায় যেন একটা ফাঁক ছিল। হতাশাগ্রস্ত রাজবংশীরা এখন উপজাতি হতে চেয়ে আন্দোলন শুরু করেছে।এর ফলে গোয়ালপাড়া, পূর্ণিয়া এবং নেপালের নিম্ন অংশের মানুষেরা হিন্দু বলে পরিচিত।[৪৫] বিস্তারিত আলোচনার জন্য সময় অতিবাহিত হওয়ায় ইতিমধ্যে লর্ড লেথিয়ান যে তালিকা প্রকাশ করেন তাতে রাজবংশীদের তালিকাভুক্ত করা হয় নি। ক্ষত্রিয় সমিতি তখন বাংলা সরকারের সংস্কার আধিকারিকের নিকট সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ থাকায় Depressed Class-এর অর্ন্তভুক্ত করার জন্য আবেদন করেন। সেই সঙ্গে Depressed Class এর পরিবর্তে তপশিলি জাতি লেখারও আবেদন করেন। ১৯৩৩ সালের ১৬ ই জানুয়ারি ভারত সরকার এক আদেশ বলে Depressed Class -এর পরিবর্তে তপশিলি জাতি লেখারও অনুমোদন করেন। এই আবেদন নামায় বলা হয়েছে, নিম্নবর্গীয় জাতি মন্দিরে প্রবেশ, অস্পৃশ্যতা, শিক্ষা, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্ত প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে। বঙ্গীয় সরকার ঐ সালেই একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করে এবং ঐ তালিকায় রাজবংশীদেরও অর্ন্তভুক্ত করা হয়।[৪৬] (The term scheduled Castes in place of Depressed Class should be written and it was accepted by the Govt. of India, Resulation

dt. 16th Jannuary 1933. It is also stated that untouchablity, Temple Entry, were to be taken into consideration not by themselves only but also with other factors. Such as educational, economical and political condition of this case. Finally at the end of 1933 the final list of scheduled castes for Bengal was published by the Bengal Reforms office and Rajbansi were included in it.)

এই তালিকাভুক্তি নিঃসন্দেহে রাজবংশী সমাজ বিশেষ সুবিধা লাভ করেছিল কিন্তু জাতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে স্ববিরোধিতা থাকায় বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয় নি। পঞ্চানন বর্মার এই প্রচেষ্টাকে উচ্চবর্ণের ভদ্ররোলেকরা সুবিধাবাদী বলে অভিহিত করেন। এই প্রশ্নের উত্তরে ড. গিরিজা শঙ্কর রায় বলেছেন, "সেই সময় রাজবংশীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থান প্রসঙ্গে যে সকল সমাজ বিজ্ঞানীর সামান্যতম অভিজ্ঞতা আছে। তারাই দ্বিধাহীনভাবে পঞ্চাননের দূরদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা না করে থাকতে পারতেন না।" [৪৭]

পরবর্তী বিষয় রাজবংশীদের চাকুরীর ক্ষেত্র সংরক্ষণের জন্য প্রাদেশিক সরকারের কাছে দাবি করেন। পঞ্চানন বর্মা দেখিয়েছেন যে অগ্রসর জাতির প্রার্থীদের সঙ্গে অনগ্রসর জাতির প্রার্থীদের পক্ষে প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে সরকারী চাকুরী পাওয়া সম্ভব নয় কারণ প্রশাসন যন্ত্রে সকলেই উচ্চশ্রেণীভুক্ত। তাই তাদের স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাত দোষে দুষ্ট এবং অনুন্নত শ্রেণীর প্রতি ঈর্ষাবশত অনগ্রসর জাতির যোগ্য প্রার্থীকে অযোগ্য বলে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করতে দেয় না। পঞ্চানন বর্মা উপলব্ধি করেছিলেন "Educational backwardness of the Rajbansis was no doubt of the main reason for the virtual exclusion from the government services. But the Rajbansis soon asserted that as the govt had taken any measures to ensure the proportionate representation of the Muslim, the same should be extended to them as well. This consideration led to the Rajbansis to adopted a resulation in 1936 in the annual conference to their samiti, thatthe protection and facilities given to Muslim in education and the govt services should also be extended to the members of the Rajbansi Community." [৪৮] রায় সাহেব অন্যান্য

অনগ্রসর জাতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে সরকারী চাকুরীতে সংরক্ষণের দাবি পেশ করেন। ফলে ১৯৩১ সালে ২৪ শে এপ্রিল সরকার কর্তৃক এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বলেন Ministrial Service বা কেরাণীগিরি চাকুরীতে শতকরা পাঁচভাগ সংরক্ষণ করা হল। তখন অনুন্নত সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা হল, "These who are educationally and economically backward." কিন্তু দেখা গেল নির্দেশ থাকা সত্বেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। ১৯৩০-৩১ সালে চাকুরী ক্ষেত্রে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে দিনাজপুর জেলায় ৬১ জন ব্যক্তি চাকুরী পেয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন নিম্নবর্গীয় জলপাইগুড়ি জেলায় ৮১ জনের চাকুরী হয়েছিল তাদের মধ্যে ২ জন রংপুর জেলায় ৭৫ জনের মধ্যে ২ জুন নিম্নবর্গীয় ব্যক্তির চাকুরী হয়েছিল। [৪৯] রাজবংশী নেতৃবৃন্দ জানতে পারলেন যে প্রাদেশিক সরকার মুসলমানদের ক্ষেত্রে আনুপাতিক ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা রাজবংশীদের ক্ষেত্রে গ্রহন করা হয় নি। পঞ্চানন বর্মা বলেন যে সরকারী চাকুরী পেতে গেলে উর্দ্ধতন কর্মচারী সুপারিশ প্রয়োজন হয়। যেহেতু রাজবংশীদের ক্ষেত্রে সুপারিশ করার মত কোন লোক নেই সে কারণে সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দিনাজপুরের প্রেমহরি বর্মা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন কিন্তু তার চাকুরী হয় নি। উক্ত বিষয়ে খোঁজ নেবার জন্য রায় সাহেব ও অন্যান্য নেতৃবর্গের সাথে Chief Seceretary এবং বাংলার গর্ভনর সাহেবের আপ্ত সহকর্মীর সঙ্গে দেখা করে উক্ত বিষয়ে জানতে চান। উত্তরে Home Member বলেন - "There are no doubt when we administer a circular, take this, we are put up against many vested interests are in the hand of people who are past masters in the keeping of appointments with the charmed circles of their relation and keeping out any one they do not want to get in." (সন্দেহ নেই আমরা যখন ঐ বিজ্ঞপ্তি কার্যকর করতে যাই তখন আমাদের অনেক কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে হয়। এটা জানা কথা যে কায়েমী স্বার্থগুলি এমন সব ব্যক্তির হাতে যারা ঐ চাকুরীগুলো তাদের প্রিয় আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে রেখে দেয় এবং অন্যদের চাকুরী চাকুরীতে প্রবেশ করাতে চায় না এবং তাদের চাকুরী থেকে বঞ্চিত করতে বিশেষ দক্ষ।)। The Rajbansi leader also appealed to Rajaj Rajendra Narayan of Cooch Behar, for the appointment of

Rajbansisi in the same administration and the Maharaja promised to fulfill their demands."[৫০]

১৯৩১ সালের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রস্তাব পেশ করেন। তাতে প্রকাশ করা হয় যে প্রাদেশিক সরকারের চাকুরীর ক্ষেত্রে শতকরা কুড়ি শতাংশ অবহেলিত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত করা হোক। পঞ্চানন বর্মা ঐ প্রস্তাবকে সমর্থন করে ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাবের পক্ষে একটি বক্তৃতা করেন — "We hear that every thing should go by superior merit and that all classes should have appointment by force of their superior merit, all these may sound very advanced classes will get the services. But where will the rest go? Will they go below the ladder or go forwarded and arrest on their right. Are they not be take the burden of Administration on their shoulders? Are they to be treat always as belong? Then should those classes who are already have had appointments always go up and others go below and further below? should this sort of things be perpetuated?"[৫১] উৎকৃষ্ট লোকেদের চাকুরী হবে? অবহেলিত লোকগুলির কী হবে? তারা কি দিনের পর দিন নীচের দিকে নামতে থাকবে অথবা উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে? তারা কি কোন দিনই প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করতে পারবে না? যারা এতকাল চাকুরী করে উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে আর অন্যরা কি নীচের দিকেই নামতে থাকবে?

রাজবংশী নেতৃবৃন্দের আরো দাবি প্রতিটি আইন সভা এবং স্বশাসিত বোর্ডগুলিতে সম পরিমান প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হবে। ক্ষত্রিয় সমিতির প্রস্তাবক্রমে সম্পাদক হিসেবে পঞ্চানন বর্মা ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং প্রাদেশিক সরকারের প্রধান আধিকারিকদের চিঠি লিখে দাবি করেন — "The matter of administration Municipal, Village Committees and Panchayet should have established and recognised as unites and made the popular representation; That if representation of the people in the councils government is wanted, the representation might be through and every community high or low and every interest should be allowed to be represented by members of their community as they may not have identical views and fillings

on my subjects.

That the demand of small communities... sending one or few representatives?"[৫২]

রাজবংশী নেতৃবৃন্দ বুঝতে পেরেছিলেন যে সরকারের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী যারা উচ্চবর্ণের নির্দেশে চলে তারা অবশ্যই ক্ষমতাকে অপব্যবহার করবে। এ কারণে রাজবংশী নেতৃবৃন্দ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের উপর চাপ দিতে লাগলেন। উপরিউক্ত পরিশ্রম এবং শারিরীক অসুস্থতার কারণে অনেক অসমাপ্ত কাজ রেখে এই মহামানবের মৃত্যু হয় ২৩ শে ভাদ্র ১৩৪২ সালে (ইংরেজি ৯ ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ সালে)। তার অকাল মৃত্যুতে রাজবংশী নেতৃত্ব দিশাহীন হয়ে পড়েন।

১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে প্রথম নির্বাচনে ৩১ জন তপশিলির মধ্যে ২৫ জনই ছিলেন নির্দলীয় সদস্য এবং ৬ জন কংগ্রেস সদস্য। নির্বাচিত তপশিলি সদস্যগণ একটি গোষ্ঠী তৈরী করেন। রাজবংশী সদস্যদের মধ্যে উপেন্দ্র নাথ বর্মন ক্ষত্রিয় সমিতির সদস্য হিসেবে আইন সভার নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। নির্বাচিত সদস্যগণ আইন সভার ভেতরে নিজেদের সুবিধা অসুবিধার কথা তুলে বার বার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সরকারের কাছ থেকে নিম্নবর্গীয় জাতির উন্নতির জন্য সরকারী সাহায্য পড়াশোনা এবং সংরক্ষণের দাবি করেন।

পঞ্চানন বর্মার মৃত্যুর পর ক্ষত্রিয় সমিতির কর্মধারার পরিবর্তন হতে আরম্ভ করে। পরবর্তীকালে সামাজিক মর্যাদা অর্জনে বর্ণহিন্দুদের সাথে লড়াইয়ের পরিবর্তে ক্ষত্রিয় সমিতি গ্রাম্য রাজনীতির পরিবর্তে শহরে রাজনীতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অতীতে চাকুরী, শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে সুবিধা আদায়ের লড়াই পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক মর্যাদা আদায়ের দিকে বেশি করে ঝুঁকে পড়ে। এর প্রধান কারণ যোগ্য নেতৃত্বের অভাব। পঞ্চাননের উত্তরসূরি নগেন্দ্রনারায়ণ রায় একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি যিনি নিজের অবস্থান ঠিক রাখার জন্য যে কোনও ধরনের সমঝোতায় বিশ্বাসী। ফলে ১৯১০ সালের সামাজিক সংগঠন বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হয়। এর প্রধান কারণ সামাজিক মর্যাদার লড়াইয়ের নেতৃত্ব দেবার চেয়ে আইন সভার সদস্য হয়ে ক্ষমতা লাভ অনেক সম্মানের বলে নতুন নেতৃত্ব মনে করেন।[৫৩] অথচ যে ক্ষত্রিয় সমিতি পঞ্চানন গড়ে তুলেছিলেন তিল তিল করে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

অতিমাত্রায় উৎসাহী হবার কারণে সেখানেই সময় চলে যেতে লাগল। রাজনৈতিক কাজে পরিশ্রমের পর আর কোন শ্রমের অবসর রইল না। ক্ষত্রিয় সমিতি রাজনীতিতে প্রবেশ করার ফলে লাভবান হয়েছিল কতিপয় জোতদার, জমিদার শ্রেণির শিক্ষিত রাজবংশীরা। অনক্ষর দরিদ্র রাজবংশীরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেল। তাই স্বরাজ বসু বলেছেন, "নির্বাচনী রাজনীতিতে জয়লাভই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের একামত্র লক্ষ্য। ফলে শিক্ষা, নারীমুক্তি, ভাষা-সংস্কৃতির বিকাশ সব কিছুই থমকে গিয়েছিল।[৪৪] উপরন্তু আভ্যন্তরীন কলহ সমিতিকে দুর্বল করে তোলে। তাই দেখা যায় ১৯৩৫ সালে পঞ্চাননের তিরোধানের পর ক্ষত্রিয় সমিতি ক্ষিপ্রতা হারিয়ে ফেলে এবং সামাজিক উন্নতিও শ্লথ হয়ে পরে। প্রথম দিকে পর পর ৪ টি নির্বাচনে জয়লাভ করে রাজনীতিতে বর্ণহিন্দুদের কোনঠাসা করে ফেলে। ১৯৩৫ সালের নির্বাচনী আইনে বর্ণহিন্দুদের জন্য বরাদ্দকৃত শুধুমাত্র ১ টি আসন তাদের আরো হতাশ করে। ক্ষমতার দম্ভ এবং শিক্ষা যার বলে এতদিন তারা রাজবংশী সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি দেখিয়ে আসছিলেন তার অবসান হতে শুরু করে। এর পর ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত পর পর দুটি নির্বাচনে মুসলিম লিগের জয়লাভ পাকিস্থান সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করে দেয়। রংপুরে বর্ণহিন্দুদের ভুস্বামী শ্রেণি, মহাজন, ডাক্তার, আইনজীবী, সরকারী, বেসরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী সকলেই ছিল বহিরাগত বর্ণহিন্দু। সবাই রাজবংশী হিন্দুদের কাছে রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি এবং আর্থিক উন্নতিতে পিছিয়ে পড়ে।[৪৫]

অপর দিকে শিক্ষিত রাজবংশী শ্রেণীর উদ্ভব বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের নতুন প্রজন্মের পক্ষে মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবস্থার পরিবর্তনে ১৯৪০ সালো পর থেকে রংপুরের ভুস্বামী ও উচ্চপদস্থ বহিরাগত চাকুরীজীবীরা নিজ সন্তানদের কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। অন্যদিকে জমিদারী ব্যবস্থা পতনমুখ অবস্থায় স্থানীয় রাজবংশীরা প্রভাবশালী জোতদার শ্রেণিতে পরিণত হয়। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে রাজবংশীদের মধ্যে ছোট ছোট ভাগচাষী, ভূমিহীন কৃষক, দিন মজুরেরা রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতির উন্নয়নের মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং আর্থিক বৈষম্যের শিকার হয়ে পড়ে। সে কারণে বিশ শতকের তিন দশকের মধ্যে তারা রাজবংশী উচ্চশ্রেণি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কমিউনিষ্ট পতাকা তলে জমায়েত হতে শুরু করে।[৪৬]

১৯৩৭ সালের পর বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন

ঘটতে থাকে। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে যে দুটি নির্বাচন হয়েছিল তাতে মুসলিম লীগ জয়লাভ করে। এমতাবস্থায় জাতীয়তাবাদী নেতাদের সামনে বড় প্রশ্ন সামনে এসে দেখা দেয়, তা হলে কিভাবে মুসলিম লীগ মন্ত্রী সভাকে আটকানো যায়। বাংলার নেতৃবর্গ বিশেষ করে শরৎ চন্দ্র বোস আইন সভার বিভিন্ন সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করেন এবং মন্ত্রী সভা গঠনের জন্য নির্দলীয় প্রার্থীদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ফজলুল হকের নেতৃত্বে ১৯৪১ সালে গঠিত হয়। এই মন্ত্রীসভাকে ১১ জন নির্দলীয় সাহায্য করেন। শ্রী উপেন্দ্রনাথ বর্মন ফজলুল হক মন্ত্রী সভায় বন ও আবগারী বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন।[৪৭] এই নীতিহীন রাজনীতি ক্ষত্রিয় সমিতির পক্ষে মারাত্মক অবস্থা ধারন করে। ১৯৪৩ সালে ফজলুল মন্ত্রী সভাকে ফেলে দিয়ে খাজা নিজামুদ্দিন, ইউরোপীয় গোষ্ঠী এবং পুরানো স্বরাজ্য পার্টির সাহায্যে মন্ত্রী সভা গঠন করেন। আশ্চর্যের বিষয় ক্ষত্রিয় সমিতির প্রতিনিধি হয়েও প্রেমহরি বর্মন খাজা নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রী সভায় বন ও আবগারী বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন।[৪৮] নিজামুদ্দিন মন্ত্রী সভায় প্রেমহরি বর্মার যোগদান ক্ষত্রিয় আন্দোলন প্রচন্ডভাবে ধাক্কা খায়। প্রেমহরি বর্মা নিজের উচ্চাভিলাসকে চরিতার্থ করার জন্য উপেন্দ্রনাথ বর্মন এবং পুষ্পজিৎ বর্মার নিষেধ অগ্রাহ্য করেন।

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ক্ষত্রিয় আন্দোলনের ধারা বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে দুর্বল হতে থাকে। ১৯৩৭ সালে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু হবার পর ধর্মীয় আবেগের খুব একটা প্রয়োজন দেখা দিল না। উচ্চবর্গীয়দের সাথে নিম্নবর্গীয়দের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র আর থাকল না। রাজবংশী প্রার্থী সংরক্ষিত আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভের পথ সুগম করে। ১৯৪০ সালের পর থেকে রাজবংশী নেতৃবৃন্দের কাছে উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করার জন্য কোন দলের দিকে ঝুকবে সেটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষত্রিয় আন্দোলন গৌণ হয়ে পড়ে। ক্ষত্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে নির্বাচনে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। তাই ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে দেখা যায় যে ক্ষত্রিয় সমিতি থেকে পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কেবল নগেন্দ্র নারায়ন রায় জয়ী হয়েছিলেন। দিনাজপুরে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রার্থী রূপনারায়ণ রায় জয়ী হয়েছিলেন। বাকি রাজবংশী নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত হয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থীরূপে। যেমন হরেন্দ্রনাথ রায় (দিনাজপুর), মোহিনীমোহন বর্মন (জলপাইগুড়ি -

শিলিগুড়ি), রজনীকান্ত রায় বর্মন (রংপুর), হারানচন্দ্র বর্মন (দগরা - পাবনা), উপেন্দ্রনাথ বর্মন জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে ক্ষত্রিয় সমিতির প্রার্থী হিসেবে নির্দল প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেছিলেন। পরে তিনিও কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন।[৫৯] এখানে উল্লেখ্য যে এই আইন সভার সদস্য হিসেবে (কমিউনিস্ট সভ্যরা), জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রহ্ম ও রূপনারায়ণ রায় ছিলেন।

সুতরাং বলা যায় "As a result of this scenario, the scheduled castes failed to emerge as a separate consolidated group in Bengal politics. They operated essentially as an interest group with the established political parties negotiating with its leaders and actually winning many of them over at different junchers."[৬০]

১৯৪৭ সালের ২০ শে জুন দুপুরে বঙ্গীয় আইন সভায় ভারত বিভাজনের জন্য অধিবেশন বসে। সর্ব প্রথম ৭ নং ধারা অনুসারেই ভোট হয়। তার আগে মি. জিন্না হুইপ জারি করে মুসলিম লীগ এবং তাদের সমর্থক এম. এল. এ-দের অতি অবশ্যই ভারত ভাগের পক্ষে ভোট দেবার কথা বলেন। বিধান সভায় দেশ-বিভাগ প্রস্তাব পেশ করার পূর্বেই কারেন্সি নোটের থলি ভর্তি করে নবাবজাদা লিয়াকত আলি কলকাতায় উপস্থিত হয়েছিলেন।[৬১] ২৫০ জন বিশিষ্ট আইন সভায় ২১৬ জন সদস্য প্রথম ধাপের ভোটে অংশ গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ১২৬ জন সদস্য একটি নতুন এবং আলাদা গণ-পরিষদ গঠনের পক্ষে অর্থাৎ ভারত ভাগের পক্ষে ভোট দেন। গভর্ণর এস বারোজ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম করে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভোটের ফলাফল জানিয়ে দেন।[৬২]

উল্লেখ করা যায় যে সেদিন কমিউনিস্ট সদস্যরা (জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রহ্ম এবং রূপনারায়ণ রায়) প্রথম ধাপের ভোটে অংশ গ্রহণ করেননি। কোন এক অজ্ঞাত কারণে হক সাহেব ছিলেন কলকাতার বাইরে। ১২৬ জন বঙ্গবীর সেদিন সংখ্যালঘু বিনিময়ের কথা মুখে না এনে ভারত ভাগের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ১২০ জন মুসলমান ৫ জন তপশিলি হিন্দু এবং একজন ভারতীয় খিস্টান। তপশিলি হিন্দুরা হলেন সর্বশ্রী নগেন্দ্রনারায়ণ রায় (মন্ত্রী), দ্বারিকানাথ বারুবী (মন্ত্রী), ড. ভোলানাথ বিশ্বাস (সংসদীয় সচিব), হারানচন্দ্র বর্মন (সংসদীয় সচিব) এবং

গয়ানাথ বিশ্বাস।

অতএব ১৯৪৭ ভারত বিভাজনের পর রংপুর সমিতি অধীনে আন্দোলনরত রাজবংশী ভূমি তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের রাজবংশীরা ভারতীয় সংবিধান মতে তপশিলি হিন্দু মর্যাদা লাভ করে। আসামের তপশিলিগণ হিন্দুর মর্যাদা লাভে বর্তমানে আন্দোলনরত। ইতিমধ্যে অনেকেই উপজাতির খাতায় নামও লিখিয়েছেন। আর বাংলাদেশের রাজবংশী শ্রেণি নতুন দেশে সংখ্যালঘু হিসেবে নিজেদের মানিয়ে নেয়। নিজ দেশের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে তারা নিজ সম্প্রদায়ের সমস্যা মোকাবিলায় আবার নতুন করে যাত্রা শুরু করেন।

দেশ ভাগের পর কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমায় ১৯৬১ সালের ৮ ই নভেম্বর উপেন্দ্রনাথ বর্মনের সভাপতিত্বে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে যা বর্তমানে (উত্তর ও দক্ষিণ), জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে ক্ষত্রিয় সমিতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে।

দেশ বিভাগের পর উপেন্দ্রনাথ বর্মন। সতীশচন্দ্র সিংহ রায়, উমেশচন্দ্র মন্ডল, শ্যামাপ্রসাদ বর্মন, যজ্ঞেশ্বর রায় প্রমুখ নেতৃবর্গ কংগ্রেসে যোগদান করায় ক্ষত্রিয় সমিতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মতো নেতা আর দেখা যায় না।